



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1010 - 1017

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের রচিত হিন্দি দোঁহায় ভাবানুভূতি ও আবেগাতিশয় : একটি সমীক্ষা

ড. সুবীর ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: subirghosh@bhu.ac.in

 0000-0002-4898-5502

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Bharatendu
Harishchandra,
doha, Hindi
literature, rasa
theory, social
consciousness,
nationalism,
moral philosophy.

Abstract

Bharatendu Harishchandra, often regarded as the father of modern Hindi literature, revolutionized the literary landscape of 19th-century India through his dohas—concise poetic couplets that blend emotion, social awareness, and moral instruction. This study explores the multifaceted dimensions of Bharatendu's dohas, focusing on the expression of personal emotions, including love, sorrow, and the transient nature of life, alongside his engagement with social issues such as poverty, superstition, and civic responsibility. Furthermore, the research examines the poet's nationalist sentiment, highlighting how his dohas cultivate a sense of patriotic duty and collective consciousness. Employing a literary-historical approach, the paper analyses the structural and aesthetic aspects of his dohas, including their rhythmic precision, brevity, and rhetorical devices, which amplify the emotional and didactic impact. Bharatendu's mastery of rasa theory—the subtle interplay of emotional flavors—is emphasized, demonstrating how love, humor, pathos, and moral reflection coexist within his compact couplets. This study argues that the enduring relevance of Bharatendu's dohas lies in their ability to resonate with contemporary readers while simultaneously preserving the literary and cultural ethos of his era. Ultimately, his dohas serve as a bridge between traditional literary forms and modern social, ethical, and nationalist consciousness.

Discussion

ভূমিকা : ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে ভারতীয় সাহিত্যজগত এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। উপনিবেশিক আধিপত্য, সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, আধুনিক বোধের বিকাশ, এবং নবজাগরণমূলক সংস্কারচেতনাই সেই সময়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে রূপায়িত করেছিল। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কেন্দ্রে ছিলেন একাধিক সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ; কিন্তু হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি

কেবল নতুন সাহিত্যধারার সূচনা করেননি, বরং ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজবোধের এক নবযুগের স্থপতি হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্য সাধনা হিন্দি ভাষাকে আধুনিক রূপ দেয়, নাটক ও সাংবাদিকতায় এনে দেয় অভিনব প্রাণশক্তি, এবং কাব্যচর্চাকে ফিরিয়ে নেয় মানবিকতার উর্বর ভূবনে। বিশেষত তাঁর লেখা দোঁহাগুলি চিন্তা, আবেগ, ভাষাশিল্প ও নান্দনিকতার দুর্লভ সমন্বয় হিসেবে হিন্দি ছন্দসাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে।

দোঁহার রীতিগত বৈশিষ্ট্য ও ভরতেন্দুর দোঁহা-চর্চার পটভূমি

দোঁহা ভারতীয় কাব্যধারার এমন একস্বতন্ত্র রীতি, যা সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাববোধের শক্তিশালী বাহক হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে টিকে রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মাত্র দুটি চরণের এই ছোট্ট কাঠামো মধ্যযুগীয় লোককাব্য থেকে আধ্যাত্মিক সাধনা, ভক্তিকাব্য থেকে লোকসংস্কৃতির যাবতীয় অনুভূতিকে ধারণ করার এক বহুমুখী নান্দনিক প্রকরণ তৈরি করেছে। দোঁহার মধ্যে রয়েছে একদিকে লোকধর্মী সরলতা, অন্যদিকে গভীর দার্শনিক ব্যঞ্জনার পরম শৈলী। এই দ্বৈত গুণই দোঁহাকে ভারতীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যে একটি অনন্য স্থান দিয়েছে। দোঁহা হিন্দি-রীতিকালের একটি প্রাচীন ছন্দরীতি – মূলত দুই পংক্তিতে স্থাপিত চার পদের স্বল্পায়তন কাব্যরূপ। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরই তাকে করেছে গভীর ভাবসংকোচনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। দোঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপতা, ধ্বনিসৌকর্য ও ক্ষুদ্রায়তনের মধ্য দিয়ে মহৎ ভাব ব্যক্তকরণ। দোঁহার মূল বৈশিষ্ট্য হলো তার কঠোর মাত্রা বিন্যাস – ১৩ ও ১১ মাত্রা মিলে প্রতিটি চরণ গঠিত হয়। এই কঠোর কাঠামোর মধ্যেও কবি তার অনুভূতিকে তীব্রভাবে সংহত করেন, যার ফলে দুই মাত্রা চরণের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনদর্শন, প্রেম, সামাজিক বেদনা কিংবা আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান দুর্দান্ত ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পায়। তাই দোঁহা ছোট হলেও তার ভাববস্তুর বিস্তার অনেক বড়। মধ্যযুগে এটি এত জনপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ ছিল, – এর মুখ্যত মৌখিক রূপ। দোঁহার সরল বাকবিন্যাস সহজে মুখে লেগে থাকে ও ছড়িয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ কাব্যে ক্লাস্ত পাঠক-শ্রোতার জন্য সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত ভাবপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করে।

এই দোঁহার উৎস আপভ্রংশ ভাষার লোকধর্মী কবিতায় নিহিত। সিদ্ধাচার্যদের দোঁহা যোগতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে ঘনীভূতভাবে প্রকাশ করেছিল।^১ ভক্তিকাব্যে এটি প্রেম ও ভক্তির মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম আবেগকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল – রাধাকৃষ্ণ প্রেম, দেহাত্মক অনুভূতি অথবা ভক্তের ঈশ্বর-অশ্বেষার ব্যাকুলতা সবই দোঁহার কাঠামোতে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছিল। রাজস্থানি ও উত্তর ভারতের লোককথায় দোঁহা কখনো ছিল দীর্ঘ কাহিনীর সংকেতবাহী অংশ, আবার কখনো ছিল গ্রামীণ জীবনের অনুভূতির ভারবাহক বানীরূপ। কিন্তু আঠারো ও উনিশ শতকে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দোঁহা সাহিত্যচর্চায় কিছুটা অন্তরালে চলে যায়। নতুন সাহিত্যরূপ – গদ্য, প্রবন্ধ, আধুনিক কাব্যরীতি উত্থানের কারণে দোঁহা তেমন ভাবে চর্চিত হতে দেখা যায় না। এই সময়েই ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র দোঁহাকে নতুন জীবন দান করেন। তিনি দোঁহার ঐতিহ্যকে কেবল পুনরুদ্ধারই করেননি, বরং আধুনিক সাহিত্যিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে তাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেন। তাঁর কাছে দোঁহা শুধুমাত্র ছন্দ বা আঙ্গিক নয়; এটি ছিল এমন এক অভিব্যক্তির ভাষা, যা আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যকে জুড়ে দিতে পারে। ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র দোঁহাকে শুধু রীতি মাত্র চর্চার স্তরে রাখেননি; বরং এর পরিসরকে আধুনিকতার আলোয় নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর দোঁহায় শৈল্পিক মুঙ্গিয়ানা যেমন অনন্য, তেমনি নিহিত রয়েছে অন্তরঙ্গ মানবিক অনুভূতির বিশুদ্ধ প্রকাশ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দোঁহার সংকুচিত কাঠামো মূলত আবেগের গভীরতা প্রকাশের জন্যই আদর্শ। কোথাও কোথাও তাঁর দোঁহায় রয়েছে আত্মজিজ্ঞাসার গূঢ় সুর, আবার কোথাও সামাজিক সংকটের প্রতি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। কখনো প্রেম ব্যথা, কখনো জীবনের অস্থায়িত্ব, কখনো আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা – সবই তিনি দোঁহার কুশল বিন্যাসে এমনভাবে ধরেছেন যে পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়। এমনকি তাঁর ভাষা যখন অত্যন্ত সরল, তখনও তার অন্তর্গত ভাবানুভূতি বহন করে চলে গভীর সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক উপলব্ধি।^২

ভরতেন্দু এমন এক যুগে জন্মেছিলেন, যখন ভারতীয় সমাজ পশ্চিমা আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, সামাজিক মূল্যবোধে আন্দোলন শুরু হয়েছে, শিক্ষায় নতুন চিন্তার প্রবল সঞ্চয় ঘটছে। তাঁর দোঁহাগুলিতে এই পরিবর্তনশীল সমাজমানসের প্রতিফলন স্পষ্ট। একদিকে ব্যক্তিমানসের নৈঃশব্দ্য, অন্যদিকে সমাজের বিবর্তন – দুয়েরই সমান্তরাল চলন তাঁর দোঁহাকাব্যকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। ভরতেন্দুর দোঁহায় ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি বহুমাত্রিক। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা,

প্রেমানুভূতি, অস্তিত্ববোধ, সমাজ সচেতনতা, আধ্যাত্মিকতা, সবই তাঁর দোঁহার সংক্ষিপ্ত রেখায় অবলীলায় ধরা পড়ে। এখানেই রয়েছে তাঁর কাব্য-নৈপুণ্য; কারণ দোঁহার কাঠামোগত শাসন বা মাত্রাবদ্ধতা কখনো তাঁর ভাবপ্রকাশকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। বরং সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান নতুন শৈল্পিক স্বাধীনতা। উদাহরণস্বরূপ, ভরতেন্দুর বহু দোঁহায় দেখা যায় বাক্যের মিতব্যয়িতা, কিন্তু শব্দের গভীর সঞ্চর -

“जामैं रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय।

बात अनूठी चाहिए, भाषा कोऊ होय।”^৩

তাঁর রচনায় ‘কম শব্দে বেশি অনুভূতি’ - এই নীতি যেন সর্বদাই অনুসৃত হয়েছে। ফলে তাঁর দোঁহা পাঠককে শুধু অর্থ দেয় না; দেয় অভিজ্ঞতা, দেয় অনুভবের সহযাত্রা। দোঁহায় ভরতেন্দুর আবেগপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর প্রেমবোধ। প্রেম তাঁর কাছে কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়; জীবনের দার্শনিক উপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দু। প্রেমে যেমন আছে আকর্ষণ, তেমনি আছে বেদনা, বিভ্রম, প্রত্যাশা এবং আত্মসমর্পণের গূঢ়তা। তাঁর দোঁহাগুলিতে প্রেম কখনো সরল, কখনো জটিল, কখনো রোমান্টিক, কখনো আবার আত্মবিধুর। কিন্তু সবক্ষেত্রেই প্রেম একটি মানবিক শক্তি হিসেবে উপস্থিত। এই কারণেই তাঁর প্রেমদোঁহা হৃদয়কে স্পর্শ করে, আবার মনকে ভাবায় -

“प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय।

जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय।”^৪

তবে কেবল প্রেম বা আত্মঅভিজ্ঞতা নয়, ভরতেন্দুর দোঁহায় সমাজ-চেতনারও একটি শক্তিশালী ধারা রয়েছে। তিনি তাঁর সময়ের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, জাতিভেদ, শিক্ষা ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনা কখনো উগ্র বা বিদ্রূপাত্মক হয়নি; বরং মানবিক দায়বোধের ভিত্তিতে সমাজকে উপলব্ধি করার এক দায়ময় সুর তাঁর দোঁহায় প্রতিফলিত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ভরতেন্দুর দোঁহায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা। তবে এটি ঐতিহ্যগত তপস্যামুখী আধ্যাত্মিকতা নয়; বরং আত্ম-অন্বেষণমূলক আত্মিক দর্শন, যেখানে মানবজীবনের অস্থায়ীতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, এবং নিজস্ব সত্তার উপলব্ধি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর দোঁহায় আধ্যাত্মিকতা মৃদু, গভীর এবং মননে রূপান্তর আনতে সক্ষম -

“सब दीननि की दीनता, सब पापिन को पाप।

सिमट आइ माँ में रह्यौ, यह मन समुझहु आप।”^৫

ভরতেন্দুর দোঁহা সংক্ষেপে যেন যুগচেতনার অনুবাদ— যেখানে ব্যক্তিমানস ও সমষ্টিমানস মিলেমিশে যায় এক সুরেলা বুনটে। ফলে তাঁর দোঁহা শুধু সাহিত্যিক কীর্তি নয়; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মননশীল ইতিহাসেরও অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভরতেন্দুর সময় ছিল সাংস্কৃতিক জাগরণের যুগ— পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমাজে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠছে, সামাজিক অসাম্য, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়ন সাধারণ মানুষের জীবনকে গভীরভাবে আঘাত করছে। এমন একসময় সাহিত্যের প্রয়োজন ছিল এমন ভাষা, যা সরাসরি, ক্ষুরধার এবং জনমানসের কাছে সহজেই পৌঁছায়। দোঁহা এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত। সংক্ষিপ্ত কাঠামো ভরতেন্দুকে সুযোগ দেয় অল্প শব্দে গভীর বক্তব্য, সামাজিক ব্যথা অথবা ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে। তাঁর দোঁহার ভাষা সরল, স্বচ্ছ এবং দৈনন্দিন জীবনের শব্দভাণ্ডারে গঠিত, ফলে সাধারণ পাঠকের সঙ্গেও তাঁর দোঁহা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। ভরতেন্দুর দোঁহার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি শব্দের জটিলতা বা অতিরিক্ত অলঙ্কারের ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন। বরং তিনি দোঁহার মধ্যে এমন ভাষিক স্বচ্ছতা এনেছেন যাতে শব্দ নিজেই ভাবের বাহক হয়ে ওঠে। তাঁর দোঁহার শব্দচয়ন সংক্ষিপ্ত, ছন্দ চলমান ও নির্মল, যেখানে আবেগের ঘনত্ব পরিমিত কিন্তু তীক্ষ্ণ। এই ঘনীভবন দোঁহাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বহুরৈখিক অর্থ - দুটি চরণের ভিতরেই তিনি ব্যক্তিগত বেদনা, সামাজিক ক্ষোভ অথবা মানবিক প্রেমকে কখনো সরাসরি, কখনো রূপকের আড়ালে প্রকাশ করেছেন -

“बिनु गुन जोबन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि।

शुद्ध कामना तैं रहित, प्रेम सकल रस-खानि।”^৬

ভরতেন্দুর দোঁহা গভীরভাবে আবেগ সম্পন্ন হলেও তা কখনো কেবল ব্যক্তিগত নয়। শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু, জীবনের দুঃখ-কষ্ট তাঁর অভ্যন্তরীণ বেদনার উৎস হলেও সেই বেদনা তিনি সামাজিক অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দোঁহায় তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক বেদনা একে অন্যের পরিপূরক। সামাজিক কুসংস্কার, জাতিভেদ, দুর্নীতি, শোষণ, শিক্ষার অভাব – এসব সমস্যা তিনি দোঁহার সংক্ষিপ্ত বাণীতে তীব্রভাবে তুলে ধরেছেন। ভরতেন্দুর দোঁহায় প্রেম একদিকে মানবিক কোমলতা প্রকাশ করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক চেতনায় ভাষাশ্রীতি, দেশপ্রেম ও জাতীয় গৌরবের অনুভূতিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে –

“নিজ भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल

बिना निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सुल।”^৭

রূপক ও চিত্রকল্প ব্যবহারে ভরতেন্দু দোঁহার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন, তবে তাকে আধুনিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রূপকগুলি সাধারণত দৈনন্দিন বস্তু, প্রকৃতি, লোকজ জীবন, সাংস্কৃতিক প্রতীক অথবা মানবসম্পর্ক থেকে নেওয়া, যা পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে। রূপকগুলির সাহায্যে তিনি জটিল অনুভূতিকে সহজ চিহ্নে রূপান্তর করেন, ফলে দোঁহার ভাবার্থ হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক –

लोक लाज की गाँठरी, पहिले देइ डुबाय।

प्रेम सरोवर पंथ में, पाछें राखै पाय।^৮

ভরতেন্দুর দোঁহার ভাব আতিশয্য : ব্যক্তিগত ও সামাজিক আবেগের বিশ্লেষণ

ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের দোঁহাগুলির ভাবমাত্রা বিচার করলে প্রথমেই যে বিস্ময়টি ধরা পড়ে তা হল তাঁর অনুভূতির দ্বিমাত্রিকতা – একদিকে গভীর ব্যক্তিগত বোধ, অন্যদিকে সমান তীব্রতার সামাজিক আবেগ। তাঁর দোঁহা কেবল অন্তর্গত যন্ত্রণা কিংবা প্রেম-বিরহের সরল কাব্য নয়; বরং এর ভিতরে নিহিত রয়েছে এক উন্মেষমান জাতির আর্তি, সময়ের সংকট, সমাজের বৈপরীত্য এবং যুগ-রূপান্তরের অভিঘাত। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেমন আবেগের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে দোঁহায় প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনই সমষ্টিগত মানবিক যন্ত্রণা সেখানে বৃহত্তর মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই দ্বিমাত্রিক আবেগকে একই কাব্যরূপে সুনিপুণভাবে ধারণ করার ক্ষমতা ভরতেন্দুর দোঁহাকে কেবল সাহিত্য-অনুভূতি নয়, ইতিহাস ও সমাজবোধের এক জীবন্ত দলিল করে তোলে। ব্যক্তিগত আবেগের ক্ষেত্রে ভরতেন্দুর দোঁহায় দেখা যায় মানুষের অন্তর্গত সংগ্রাম, বেদনা, ক্ষতি, এবং মনোজগতের সূক্ষ্ম আন্দোলন। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ, পরবর্তী জীবনে দায়িত্বের ভার, স্বাস্থ্যহীনতা এবং উদ্বেগ— এই অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর কাব্যমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দোঁহায় তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি মৃদু বিষাদ উপস্থিত হয়, যা কখনো যন্ত্রণার সরাসরি বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং মননশীল, সংযত এবং আত্মসংযমে বাঁধা বেদনারূপে প্রকাশিত। দোঁহার মাত্র ২৪ মাত্রার দুই পংক্তি এই বেদনার গভীরতাকে কমিয়ে দেয় না; বরং সীমার মধ্যেই তীব্রতা বাড্ডায় হয়ে ওঠে। তাঁর অভিব্যক্তির ভেতরে রয়েছে একধরনের ব্যক্তিগত আর্তি – একটি নীরব আত্মস্বীকারের ভাষা, যা অল্প শব্দে বহু অনুভব বহন করতে পারে। ফলে তাঁর দোঁহাগুলি প্রায়শই মানুষের একাকিত্ব, জীবনের পরিবর্তনশীলতা, এবং মনের অস্থিরতার নিটোল চিত্র তুলে ধরে।^৯

কিন্তু ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে ভরতেন্দুর আরেকটি পরিচয় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ – তিনি ছিলেন একটি যুগ-সংকটের প্রত্যক্ষদর্শী। ঔপনিবেশিক শাসনের নিচে নিস্তব্ধ, নির্যাতিত, বিভ্রান্ত ও নিষ্পেষিত ভারতবর্ষ তাঁর মনকে ব্যথিত করেছিল। এই সামাজিক যন্ত্রণাই তাঁর দোঁহার আরেক পরত। তাঁর সামাজিক আবেগ কোনো রাজনৈতিক স্লোগানে রূপ নেয় না; বরং তা মানুষের বেদনা ও স্বপ্নের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায়। অনেক দোঁহায় দেখা যায় সমাজের মুখোশধারী ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয়, এবং আত্মবিস্মৃতির বিরুদ্ধে তাঁর গভীর ক্ষোভ। কিন্তু সেই ক্ষোভও তিনি ব্যক্ত করেন সংক্ষিপ্ত ও সংহত উপস্থাপনায়— কখনো রসাত্মক পরিহাসে, কখনো তীব্র ব্যঙ্গের সুরে, আবার কখনো গুরুগম্ভীর সত্যবোধের মাধ্যমে। এখানেই তাঁর কাব্যিক দক্ষতার পরিচয় – তাঁর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার সঙ্গে সমাজের দুঃখ মিশে যায়, কিন্তু মিশ্রণটি কখনোই জোরপূর্বক নয়। বরং উভয়ের মধ্যে একটি স্বাভাবিক, অর্গানিক যোগসূত্র তৈরি হয় – যেন ব্যক্তি এবং সমাজ একই সহমর্মিতার জগতে অবস্থান করছে। তাঁর দোঁহায় যখন ব্যক্তিগত বিচ্ছেদের বেদনা উঠে আসে, তখন তার সুর

অনেক সময়ই সমাজের বৃহত্তর বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আবার যখন তিনি সমাজের অচলাবস্থা ও অবক্ষয়ের কথা বলেন, তখন সেই ক্ষোভের ভেতরেও নিজের অভিজ্ঞতার দহন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। এইভাবেই তিনি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার আবেগের সেতুবন্ধন তৈরি করেন।

সমষ্টিগত আবেগের ক্ষেত্রে ভরতেন্দুর দোঁহায় দেখা যায় এক ধরনের মানবিক উদ্বেগ – যা কেবল তাঁর নিজের সমাজ বা জাতির সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন আকার ধারণ করে। জীবনের অস্থায়িত্ব, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বিকতা, মানবমনের ভঙ্গুরতা – এই সবই তাঁর দোঁহার ভাবধারায় উপস্থিত। তিনি মানুষের ক্ষুদ্রতা এবং মহত্ত্ব – দুই-ই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর দোঁহায় বহু জায়গায় এই দ্বৈততাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। ফলে তাঁর কাব্যভুবনে দর্শনের ছায়াও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর দার্শনিকতা কখনো ব্রজভাষার স্নিগ্ধতা থেকে খাদ্য গ্রহণ করেছে, কখনো আধুনিক হিন্দি ভাষার রূঢ় সত্যবোধকে ধারণ করেছে, আবার কখনো কবীর বা রহিমের দোঁহা-ঐতিহ্যের মানবিক নির্ঘাসের অনুসরণ করেছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজস্ব রূপ নির্মাণ করেছেন। ভরতেন্দুর দোঁহাগুলিতে প্রেম-ভাবনার উপস্থিতিও আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। তবে তিনি প্রেমকে কখনো একমাত্রিক রোমান্টিক ভঙ্গিতে দেখেননি; বরং প্রেমের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের অস্থায়িত্ব, প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও প্রতিবন্ধকতাকে অনুভব করেছেন। প্রেমের উচ্ছ্বাসের চেয়ে এখানে বেশি জায়গা পায় প্রেমের অসম্পূর্ণতা ও বিচ্ছেদের গভীর ছায়া – এক একটি দোঁহা যেন জীবনের একটি ভগ্ন মুহূর্তের কথা বলে যায়, যেখান থেকে আমরা কেবল অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই –

“প্রেম সরীবর নীর হৈ, यह मत कीजी ख्याल।

पये रहैं प्यासे मरे, उलटी ह्याँ की चाल।”^{১০}

তাঁর সামাজিক আবেগের আরেক দিক হল সমকালীন সমাজের প্রতি তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ। সমাজের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা এবং অর্থলোলুপতার চিত্র তিনি অত্যন্ত সংযত ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ কখনো কটু নয়; বরং তা একটি সতর্কবাণীর মতো, যা মানুষকে নিজের দিকে ফিরে তাকাতে বাধ্য করে। দোঁহার সংক্ষিপ্ততা তাঁর এই বার্তাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। সমাজ যেখানে ভুলে যাচ্ছিল তার মানবিক সত্তা, সেখানে ভরতেন্দুর দোঁহা যেন স্মরণ করিয়ে দেয় – মানুষের প্রকৃত শক্তি তার চরিত্র ও বিবেকেই নিহিত। ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র দোঁহার মধ্য দিয়ে যে আবেগজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা বহুমান্বিতিক, গভীর, এবং সময়ের সীমানা অতিক্রম করে মানবিকতার বৃহত্তর পরিসরে গৃহীত হতে সক্ষম। তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা কখনো কেবল তাঁর ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস নয়, বরং তা সমাজের যন্ত্রণার সঙ্গে মিলেমিশে এক সমষ্টিগত অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। আবার তাঁর সামাজিক আবেগ কখনো কেবল সমাজ সংস্কারের ভাষণ নয়, বরং তা আলোকপাত করেছে মানুষের অন্তর্গত মনোবেদনার ওপর। দোঁহা তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে মানুষের মনোজগতের আয়না, যার প্রতিটি প্রতিফলনে দেখা যায় ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সত্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক অনন্য আবেগভুবন। এই কারণেই ভরতেন্দুর দোঁহার ভাবমাত্রা শুধু সাহিত্যিক মূল্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং মানবিক অভিজ্ঞতার নথি হিসেবেও তা অমূল্য।

ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের দোঁহার ভাষাশৈলী, চিত্রকল্প ও নান্দনিকতা

ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের দোঁহাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল তাঁর ভাষাশৈলীর স্বাভাবিক এবং শিল্পগত সচেতনতা। দোঁহা একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপ; শব্দমাত্রার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বহুস্তরীয় অনুভূতি এবং গভীর মনস্তত্ত্বের প্রকাশ এখানে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ভরতেন্দু এই সীমাবদ্ধতাকে বাধা হিসেবে না দেখে বরং সৃজনশীল সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দোঁহাগুলির ভাষাগত গঠন এমনই সংহত, কৌশলী ও সুনির্বাচিত যে অল্প শব্দে বহু অর্থের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছে। এটি কেবল তাঁর কাব্যদক্ষতার প্রমাণ নয়, বরং ভাষা নিয়ে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্পমানসের প্রকাশ। সাধারণত দোঁহায় যে ছন্দবিন্যাস ব্যবহৃত হয় – দুই পংক্তিতে প্রত্যেকে ২৪ মাত্রা – সে কাঠামো ভরতেন্দু নিপুণভাবে রক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি কাঠামোর দাস হয়ে থাকেননি; বরং কাঠামোর ভেতরেই তিনি নতুন ধ্বনিমাধুর্য, শব্দচয়ন ও ছন্দের গতি-সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। তাঁর দোঁহাগুলিতে শব্দের ভারসাম্য, ধ্বনির মাধুর্য, এবং

উচ্চারণ-সংগীত একটি বিশেষ আবহ তৈরি করে যা দোঁহার বার্তাকে আরও প্রবলভাবে অনুভূত করায়। উদাহরণস্বরূপ, কোথাও তিনি ‘অন্তানুপ্রাস’ ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও ‘ছেকানুপ্রাস’ এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে তা আবেগের সঞ্চারণকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। ভাষার এই ছন্দমাধুর্য তাঁর আবেগপ্রকাশের তীব্রতাকে আরও গভীর করে তোলে।

ভরতেন্দুর দোঁহায় চিত্রকল্পের ব্যবহার অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কিন্তু তা কখনোই অতিরঞ্জিত বা কৃত্রিম নয়। তিনি খুব সহজ, দৈনন্দিন, পরিচিত চিত্র ব্যবহার করে বৃহত্তর মানবিক অনুভূতিকে তুলে ধরেন। কখনো গাছের শুকনো ডাল, কখনো মেঘের অস্থির গতি, কখনো নদীর প্রবাহ— এই সাধারণ চিত্রকল্পগুলিই তাঁর দোঁহায় আলাদা অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাঁর চিত্রকল্প একদিকে যেমন বাস্তব জগৎ থেকে গ্রহণ করা, অন্যদিকে তেমনই তাতে রয়েছে ইঙ্গিত, প্রতীক ও অন্তর্নিহিত অনুভূতি।” এই চিত্রকল্প-প্রাকৃতিক, সামাজিক বা অভ্যন্তরীণ, সবই তার আবেগতাড়িত ব্যক্তিমানসকে প্রকাশের উপযোগী করে তোলে। ফলে পাঠক চিত্রটিকে কেবল মাত্র একটি দৃশ্যরূপ হিসেবে দেখে না, বরং এর ভেতরে থাকা অনুভূতির আলোড়ন উপলব্ধি করে -

“লোক-লাজ কী গাঠরী পহিলে দেই ডুভায়।

প্রেম-সরৌবর পংথ মেন্ পাঠৈ রাষ্ট্রৈ পায়।”^{১২}

দোঁহা যেহেতু সংক্ষিপ্ত রচনা, তাই এতে ভাবের ঘনত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভরতেন্দু এই ঘনত্ব তৈরি করতে কখনো তীক্ষ্ণ বৈপরীত্য ব্যবহার করেছেন, যেমন- সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশার সংঘাত, - যা মানুষের অন্তর্জগতের জটিলতাকে স্পষ্ট করে। এই বৈপরীত্য তাঁর দোঁহায় একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক রূপ নিয়ে উঠে আসে। এটি শুধু নাটকীয় প্রভাব তৈরি করে না, বরং মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বৈততা এবং জীবনের অনিশ্চয়তাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁর একটি দোঁহায় প্রথম পংক্তি যে অনুভূতির ইঙ্গিত দেয়, দ্বিতীয় পংক্তি তার বিপরীত অনুভূতি এনে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা করে। এই কৌশল তাঁর শিল্পসচেতনতার পরিচয় বহন করে -

“বিনু গুন জোবন রূপ ধন, বিনু সবার্থ হিত জানি।

শুভ্র কামনা তেন্ রহিত, প্রেম সকল রস-খানি।”^{১৩}

ভরতেন্দুর ভাষাশৈলীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শব্দের বোধগম্যতা। তিনি খুব সাধারণ হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেও তার অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে লোকভাষার ঘরোয়া স্বাদ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সংস্কৃত বা ব্রজভাষার প্রভাব। এই বহুভাষিক রূপ দোঁহাকে একদিকে সহজবোধ্য করেছে, অন্যদিকে দিয়েছে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গভীরতা। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর দোঁহায় ব্যবহৃত শব্দগুলি দ্বৈত অর্থ বহন করে, একদিকে সরল, বাহ্যিক অর্থ, অন্যদিকে প্রতীকী ও দার্শনিক অর্থ। এভাবে তিনি শব্দকে শুধু ভাষার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং তাকে একটি সাংকেতিক ও দার্শনিক বাহন করে তুলেছেন।

দোঁহার আবেগপ্রকৃতি বোঝার জন্য ভরতেন্দুর নান্দনিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করলেও তা নিয়ন্ত্রিত, সংযত এবং শিল্পিত। দোঁহায় আবেগপ্রকাশ কখনোই অপরিপক্ব বা অনিয়ন্ত্রিত নয়; বরং সুনির্বাচিত শব্দ, সংহত চিত্রকল্প এবং ঘন অনুভূতির মধ্য দিয়ে তা শৈল্পিক পরিণতি লাভ করে। তাঁর আবেগ কখনো ব্যক্তিগত বেদনাকে প্রকাশ করে, যেমন বিচ্ছেদ, একাকিত্ব, বা জীবনের অস্থিরতা; আবার কখনো সামাজিক বিকৃতি, ভণ্ডামি বা রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অন্তর্গত প্রতিবাদ হিসেবে উঠে আসে। এই দ্বৈতধর্মী আবেগ তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে আরও সমৃদ্ধ করে। পাঠক তাই তাঁর দোঁহায় ব্যক্তিগত অন্তর্দর্শন যেমন খুঁজে পান, তেমনই পান সমষ্টিগত যন্ত্রণা ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। তাঁর দোঁহায় আলোচনার মতো আরেকটি বিষয় হল ভরতেন্দুর দার্শনিক প্রবণতা। যদিও তাঁর দোঁহাগুলির বহিরঙ্গ আবেগপ্রবণতা বেশি স্পষ্ট, কিন্তু ভেতরে রয়েছে একটি গভীর দার্শনিক অভিমুখ। জীবনকে তিনি যেমন রসাত্মকভাবে দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন তার ক্ষণস্থায়িত্ব, অনিত্যতা এবং মানবজীবনের সীমাবদ্ধতাকে। বহু ক্ষেত্রে তাঁর দোঁহা একধরনের নৈতিক বোধ বা মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়, কিন্তু তা কখনোই জোর করে চাপানো নয়। বরং জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য অনুভব থেকেই এই নৈতিকতা উদ্ভূত হয়। দোঁহায় এই দার্শনিকতা একদিকে পাঠককে ভাবায়, অন্যদিকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে ধরে জীবনের মৌলিক সত্য -

“जिन पाँवन सो चलत तुम, लोक वेद की गैल।

सो न पाँव या सर धरी, जल जै है मैल ॥”^{१४}

ভরতেন্দুর দোঁহার শিল্পনৈপুণ্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিনি দোঁহাকে শুধুমাত্র কাব্যরূপ হিসেবে গ্রহণ করেননি, বরং একে সামাজিক চেতনার বাহন করেছেন। তাঁর দোঁহায় জাতীয়তাবোধ, জনজীবনের সমস্যাবোধ এবং সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ রয়েছে, যা দোঁহাকে নিছক কাব্যিক অনুভূতির স্থান থেকে সরিয়ে আধুনিক যুগের বিবেকবান আখ্যানরূপে রূপান্তরিত করে। তাঁর দোঁহাগুলি তাই শুধু নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সবমিলিয়ে বলা যায়, ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র দোঁহার শিল্পরূপকে নতুন অর্থবহ আধুনিকতা দিয়েছেন – যেখানে ভাষার মাধুর্য, চিত্রকল্পের গভীরতা, ভাবানুভূতির তীব্রতা, দার্শনিকতা, এবং সামাজিক চেতনা মিলেমিশে একটি সমন্বিত নান্দনিক রূপ তৈরি করেছে। তাঁর দোঁহাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে এক অনন্য সেতুবন্ধন নির্মাণ করেছিলেন। আর তাঁর দোঁহার ভাষাশৈলী ও নান্দনিকতার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে হিন্দি সাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উপসংহার : দোঁহা হিন্দি সাহিত্যরীতির সেই প্রাচীনতম প্রকরণ, যে তার সংকুচিত পরিসরে গভীরতম ভাবে ধারণ করতে সক্ষম, যা ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের হাতে এসে এক বিশেষ তাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক রূপ লাভ করে। তাঁর দোঁহায় ভাবানুভূতির যে রূপায়ণ দেখা যায় তা কেবল অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং ভাষাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক তত্ত্ব – এই চার স্তরের এক জটিল আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলে। তাঁর দোঁহাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে আবেগ শুধু বিষয়বস্তু নয়; বরং তা কাব্য- সৃজনের পদ্ধতি, কৌশল, নন্দনবোধ এবং সামাজিক প্রত্যয়েরও অংশ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভরতেন্দুর দোঁহায় ভাবানুভূতির প্রকৃতি তাই বহুস্তরীয় এবং বহুবিধ ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি করে। অতএব, বলাবাহুল্য যে, ভরতেন্দুর দোঁহা শুধু তার সময়ের কাব্যসাহিত্য নয়; এটি আজও শিক্ষামূলক, নৈতিক, সামাজিক এবং আবেগিকভাবে প্রাসঙ্গিক। সংক্ষিপ্ত আকারে গভীর অর্থ, মানবিক আবেগ ও সামাজিক বার্তা প্রকাশের ক্ষমতা তাকে চিরস্মরণীয় করে তুলেছে। দোঁহার এই বহুমাত্রিকতা হিন্দি সাহিত্যের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৈতিক দিককে একত্রিত করে, যা নবজাগরণের সময়ের পাশাপাশি আধুনিক পাঠকের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সংক্ষেপে বলা যায়, ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের দোঁহা কেবল সাহিত্যিক কৃতিত্ব নয়; এটি একটি সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক এবং জাতীয় চেতনার সংমিশ্রণ। তার দোঁহার মাধ্যমে পাঠক মানবজীবনের গভীরতা উপলব্ধি করে, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ অর্জন করে এবং এক জাতীয় ও মানবিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই দোঁহা আজও পাঠকের মননে সতেজ, প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণার উৎস।

Reference:

১. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল (হিন্দি অনুবাদ), ‘দোঁহা-কোষ’, সিদ্ধ সরহপাদ, বিহার রাষ্ট্র ভাষা পরিষদ, পাটনা-৩, ১৯৫৭, পৃ. ৫৩
২. ভাটনাগর, রামরতন, ‘ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র : এক অধ্যয়ন’, কিতাব মহল, ইলাহাবাদ-৫৬এ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭, পৃ. ১১৩
৩. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>
৪. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>
৫. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>
৬. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>
৭. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>
৮. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>
৯. শর্মা, রামবিলাস, ‘ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র অউর হিন্দি নবজাগরণ কি সমস্যায়’, রাজকমল প্রকাশন, নয়াদিল্লি-০২, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩, পৃ. ১৩৭

১০. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>

১১. ভাটনাগর, রামরতন, 'ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র : এক অধ্যয়ন', কিতাব মহল, ইলাহাবাদ-৫৬এ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭, পৃ. ১৭৫

১২. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>

১৩. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>

১৪. <https://www.hindwi.org/poets/bharatendu-harishchandra/dohe>